– ষষ্ঠ অধ্যায় –

অভিজিৎ সেনের গল্পের ভুবন ঃ যাপনকথার বহুস্বর

ষষ্ঠ অধ্যায়

অভিজিৎ সেনের গল্পের ভুবন ঃ যাপনকথার বহুস্বর

মানবজীবনের অজস্র তরঙ্গরাশি থেকে দুয়েকটি ঢেউকে বেছে নেন কথাশিল্পী তাঁর ছোটগল্পের বিষয়রূপে। সময়ের হস্তক্ষেপে বিষয়বোধে ঘটে যায় নানা পালাবদল। ত্রিশ-চল্লিশের দশকের স্বাধীনতা আন্দোলন, পঞ্চাশের দশকের উদ্বাস্তু স্রোত, স্বপ্নদেখা-স্বপ্নভাঙার যন্ত্রণা, নিরাশার আর্তি, জনমনের বিক্ষোভ, দারিদ্র, সত্তরের দশকের নকশাল আন্দোলনের অগ্নিগর্ভ দীপ্তি, – সবকটি বিষয়ই ছাপ ফেলেছে বাংলা গল্পের শরীরে। একের পর এক দশক পেরিয়ে নতুন ও বহুরৈখিক হয়ে উঠেছে ছোটগল্পের বিষয়বোধ। বিশেষত বিশ শতকের শেষের তিন দশকে বাংলা ছোটগল্প তার এতদিনকার কাঠামো ভেঙে নিজেকে গড়ে নিয়েছে সম্পুর্ণ নতুনরূপে। কাহিনির দীর্ঘায়ত ছায়া থেকে বেরিয়ে আসার পথ খুঁজতে খুঁজতে উত্তর-আধুনিক ও উত্তর-উপনিবেশিকতার নবায়মান অভিঘাতে নিজেকে জারিত করে এক অভিনবরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এই নবতর রূপের একজন সার্থক রূপকার হলেন সত্তরের দশকের খ্যাতিমান গল্পকার অভিজিৎ সেন।

পাঠক হিসেবে অভিজিৎ সেনের উপন্যাসই কেবল নয়, তাঁর ছোটগল্পগুলোও আমাদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। ব্যক্তিগত পছন্দের দিক থেকে লেখকেরও সম্ভবত তাঁর গল্পগুলোর প্রতিই পক্ষপাত বেশি। এক ঘরোয়া আলাপচারিতায় লেখক নিজেই জানিয়েছেন যে তাঁর রচিত কথাসাহিত্যের মধ্যে গল্পের ধারাটিই তাঁর অধিক প্রিয়। কারণ আপন চিন্তা-চেতনা ও তাৎক্ষণিক উপলব্ধির যথাযথ রূপায়ণ গল্পে যতটা সম্ভব–অন্য কোথাও ততটা নয়। আর লেখকের অভিজ্ঞতা, চিন্তা-চেতনা, উপলব্ধির ক্ষেত্রটি এতটাই বিশাল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ যে তার রূপায়ণে জীবনের প্রতিটি রঙের আত্মপ্রকাশ সম্ভব হয়েছে তাঁর গল্পে।

অভিজিৎ সেনের গল্পের বিষয় বৈচিত্র্য বিস্ময়কর। তবে তাঁর অধিকাংশ গল্পের কুশীলব অন্তেবাসী মানুষ। সাবলটার্ন চৈতন্যের আনুগত্য-প্রত্যাখ্যানের যুগপত্তা চমৎকার অভিব্যক্তি পেয়েছে তাঁর ছোটগল্পের পরিসরে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে মন্বন্তর, তেভাগা, দেশভাগ, দাঙ্গা, উত্তরকালে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক সংকট অভিজিৎ সেনের ছোটগল্পের বয়ানে উঠে এসেছে। তাঁর ছোটগল্পের প্রতিবেদনে ধরা পড়েছে নিম্নবর্গের মানুষের প্রান্তিকায়িত জীবন ও যাপনের বাস্তব, উপেক্ষিত ব্যক্তি পরিসর ও পরিবর্তন-প্রয়াসী জনমনের চলচ্ছবি। অভিজিৎ সেনের গল্পে জীবনাভিজ্ঞতা আর দেশকালের সংলাপ এমন এক নৈরাত্মসিদ্ধিতে পৌঁছায় যেখানে গল্প কেবল গল্প হয়েই থাকে না, হয়ে যায় জানার জিনিস, বোঝার জিনিস। ভাষায় মোচড়ে গল্প থেকে কাহিনি নির্বাসন একালের গল্পশৈলীর এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অভিজিৎ সেপথে হাঁটেন না। বরং তাঁর লেখনীর মধ্যে রয়েছে গল্পবলার এক আশ্চর্য আদিম মোহনীয়তা—যা আমাদের গল্প শুনতে বাধ্য করে। এর কারণ অন্বেষণ করতে গিয়ে অধ্যাপক তপোধীর ভট্টাচার্য বলছেন—

"হয়তো কথকতার প্রাক-আধুনিক ঐতিহ্যকে সময়োচিত পুনর্নির্মাণ করতে গিয়েই 'গল্প বলছি, শোনো' জাতীয় ঘরানা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চাইছেন তিনি।" [১]

এই কথকতার শৈলীর ব্যাবহার অভিজিৎ সেনের রচনার একটি বিশেষ দিক। প্রাচ্য কথকতার এই উত্তরাধিকার যেন ঔপনিবেশিক আধুনিকতার বিপ্রতীপে এক শৈল্পিক জেহাদ। আর একারণেই হয়তো উপনিবেশিক মননাশ্রয়ী 'নির্মিত বাস্তব' এর সত্যতার চাইতে লেখকের কাছে জাদু-বাস্তবতা বা magic realism এর সত্যতা অধিক গ্রহণযোগ্য। কারণ যে বিষয়গুলি বর্তমান মূলস্রোতের সাহিত্যে বাস্তব হিসেবে তুলে ধরা হয়, এর অভ্যন্তরে যথার্থ বাস্তবের অনুপাত একেবারেই নগণ্য। কারণ সম্ভবত—

"ব্যবসায়িক কারণে ব্যাপক বিজ্ঞাপন দিয়ে হালকা জনরুচির সাহিত্য রচনা করার

এবং তাকেই শ্রেষ্ঠ বলে চালাবার কৌশল প্রকাশকরা গ্রহণ করাতে এবং সাধারণ পাঠক তা গ্রহণ করাতে গভীর বিশ্লেষণী এবং উচ্চাঙ্গের সাহিত্যের প্রতি সাধারণ ভাবে একটা অশ্রদ্ধা তথা তাচ্ছিল্য উৎসাহ পেতে থাকে।'' [২]

কিন্তু এই তথাকথিত 'মূলস্রোত'-এর পথে হাঁটতে উৎসাহী নন আমাদের লেখক অভিজিৎ সেন। বরং এক বিকল্প বাস্তবতাকে কাহিনির আধেয় রূপে গ্রহণ করতেই তিনি অধিক উৎসাহী। আর যেহেতু প্রান্তিকায়িত, শোষিতগোষ্ঠীর বিশ্বাস, ভাবনা, বয়ানই প্রাধান্য পায় তাঁর গল্পের অন্তর্বয়নে –তাই এই বিকল্প বাস্তবতা কখনো কখনো মিশে যায় আধিবাস্তবতার সঙ্গে। কারণ লেখক মনে করেন,

"মধ্যবিত্তমেদুর জগৎ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে ব্রাত্যজনের সেই প্রান্তিকায়িত পরিসরে যেখানে অনায়াসে আধিবাস্তব মিশে যায় বাস্তবে। উচ্চ সংস্কৃতির মান্যতা-প্রাপ্ত আচরণবিধির বিপ্রতীপে রয়েছে যে কালো মহাদেশ, সেখান থেকেই তুলে আনতে হবে ছোটগল্পের রক্তমাংস, অস্থিমজ্জা।'' [৩]

ছোটগল্পের এই 'রক্তমাংস', এই 'অস্থিমজ্জা'র সন্ধানে অভিজিৎ সেই 'কালো মহাদেশ' এর যত্রতত্র ঘুরে বেড়িয়েছেন। দেখেছেন এই মহাদেশে উপাদানের কোনো অভাব নেই। কিন্তু এই উপাদানগুলিকে গল্পে রূপদানের ক্ষেত্রে তাঁর কিছু আধারের প্রয়োজন। আর এই আধারই হয়েছে কখনো যাদু বাস্তবতা, কখনো নিরাবরণ সমাজবাস্তব, আবার কখনো যৌনতা। কিন্তু উল্লেখ্য যে এর মাঝে কোনোটিই প্রয়োজনসাপেক্ষ আরোপিত আধারমাত্র নয়। এর প্রত্যেকটিই গল্পে এসেছে অত্যন্ত আমোঘ ও স্বাভাবিকভাবে। তাই হয়তো লেখক পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় অভিজিৎ সেনের গল্প সম্বন্ধে বলেছেন,

"পাঠক হিসেবে গল্পগুলির মধ্যে যত ঢুকি ততই বুঝি এ আমাদের জীবনের নানা ঋতুর আখ্যান।'' [৪]

অর্থাৎ লেখকের বহুরৈখিক বিষয়বোধ নানা ঋতুর বৈচিত্র্যময় ছবি আঁকে পাঠকের মনে।

বিস্ময়কর ন্যারেশন, কথক ও লেখক সত্তার ঐকান্তিকতা, অদ্ভুত কাহিনির বুনোট—অভিজিতের গল্পরাজিকে সমৃদ্ধ করে।

অভিজিৎ সেনের বহুচর্চিত 'লখিন্দর ফিরে আসবে' গল্পের আলোচনার মাধ্যমেই আমরা অভিজিতের গল্প পরিক্রমায় উদ্যোগী হতে পারি। গল্পকার অভিজিতের গল্প বলার শৈলীর একটি বিশেষ দিক কথক ও লেখকসত্তার ঐকান্তিকতা, বা যৌগপত্তা—'লখিন্দর ফিরে আসবে' যার সার্থক প্রমাণ। তথাকথিত যুক্তি নির্ভর আধুনিকতার খোলস ভেঙে বাস্তব ও অবাস্তবের মিশ্রণে উত্তর আধুনিক ভাবনায় ভাবিত লেখক অভিজিৎ গল্পটিকে নিয়ে যান এক এমন অবস্থানে যেখানে 'যুক্তিবাদী আমি', 'মধ্যবিত্ত আমি', 'বিশ্বাসবাদে আক্রান্ত আমি' একাকার হয়ে যায়। আসলে এই 'আমি'র বিরুদ্ধেই যেন তাঁর লড়াই। 'আমি' তে লুকিয়ে থাকে স্বার্থ, অন্যদিকে 'আমরা'য় ঐকান্তিকতা। লেখক 'আমি' তে বিশ্বাসী নন, 'আমরা'য় বিশ্বাসী।

"ব্যাক্তির সম্পর্কও নিছক ব্যাক্তিগত নয় কখনো; সম্পর্কের আলো অন্ধকার চড়াই উৎরাই কৌনিকতা উচ্চবচতা কীভাবে সামাজিক বিধির রৈখিকতাকে অনবরত বির্নিমাণ করে চলেছে। এসব দেখতে দেখতে এবং দেখাতে দেখাতে গল্পকার অভিজিৎ ও তাঁর গল্পবিশ্ব পথ থেকে পথান্তরে আর রূপ থেকে রূপান্তরে বিবর্তিত হচ্ছে।'' [৫]

তাই হয়তো গোষ্ঠী নির্ভর ভাবনা, বিশ্বাস ও বাস্তবতাই লেখক অভিজিৎ সেনের গল্পের প্রধান আধেয়। লক্ষীন্দর-বেহুলার 'মনসামঙ্গল'-এর গল্প কোনো ব্যক্তি বিশেষের গল্প নয়। এ একটি গোষ্ঠীর আত্মমর্যাদালাভের গভীর আকাঙ্ক্ষার আখ্যান, যে আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত হয় উপসংহারে। গল্প বলার এই ঢঙ আজকের নয়, এ আমাদের ঐতিহ্যাশ্রিত। 'ঠাকুরমার ঝুলি'র যুগ থেকে চলে আসা এই গল্প বলার ঢঙ আমাদেরকে কেবল বাস্তব ভুলিয়ে আধিবাস্তবতার স্তরে বিচরণ করতে শেখায়, এমন নয়, বরং এর মাঝেই রয়ে যায় যথার্থ বাস্তব যা তথাকথিত আধুনিক গল্পে সেভাবে উঠে আসে না। গল্প বলার এই বিকল্প ঘরানার এক অদ্ভুত আকর্ষণ আছে যাতে চারপাশের ক্ষুদ্র বাস্তব

হারিয়ে গিয়ে বৃহৎ সত্য, সূক্ষ্ম মনন জাগ্রত হয়। পাঠক শ্রোতা হারিয়ে যায় গল্পের অতলে। 'লখিন্দর ফিরে আসবে' গল্পে গল্প বলার ও গল্প শোনার এই মোহনীয়তাকে ব্যক্ত করেন লেখক অভিজিৎ এই ভাবে–

"...অশোক গল্প শুরু করল। কিছুক্ষণের মধ্যেই হাওড়া স্টেশনে হাজার হাজার লোকের ব্যস্ততা, ক্রমাগত গাড়ির আসা যাওয়া, মাইক্রোফোনের দুর্বোধ্য নির্দেশ, হকার, পুলিশ, নিত্যযাত্রী, ভিখারি সব যেন ভোজবাজির মত আমার চোখের এবং কানের সামনে থেকে মিলিয়ে গেল। বাস্তব হয়ে উঠতে লাগলো অশোকের গল্পের চরিত্রগুলো, সেই সব চরিত্রকে ধরে রেখেছে যে প্রকৃতি– নদী নালা আকাশ আর বাতাস। অচেনা, অজানা মানুষ আর তাদের বোধবিশ্বাস, দুঃখকষ্ট, পাপপুণ্য সব যেন আমাকেও এক নতুন বোধের জগতে নিয়ে এসে হাজির করল।'' [৬]

এই বোধ কোনো ব্যক্তি বিশেষের অনুভূতি মাত্র নয়, এ এক নৈর্ব্যক্তিক বোধ। আধুনিক ব্যক্তি কেন্দ্রিক সাহিত্যের যুগে এই নৈর্ব্যক্তিক বোধের অবতারণার কারণ অন্বেষণ করতে গিয়ে দেখা যায় এ যেন লেখকের এক স্বেচ্ছাকৃত প্রয়াস। আহরিত আধুনিকতার ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার বদলে শেকড়ের কথকতার আদল গ্রহণে লেখকের উৎসাহ অধিক। তাই গল্পের অবতারণা। গল্প শুনছে এক আধুনিক শিক্ষিত লোক তারই এক সহকর্মীর মুখে, যে গল্পের বাইরের আবরণ অতিপ্রাকৃতিক আচ্ছাদনে ঢাকা থাকলেও ভিতরে রয়েছে গভীর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। এখানেই লেখক দেখালেন এক নতুন মনস্তাত্বিক উপন্যাসের প্যাটার্ন যা কখনোই বলে না মনস্তত্ত্ব নির্ভর উপন্যাস কেবল ব্যক্তিকেন্দ্রিক, শহরকেন্দ্রিক হবে। তাই হয়তো মানসিক রোগের চিকিৎসা করে এক তথাকথিত ভণ্ড তান্ত্রিক। এ চিকিৎসায় সমাধান হয়, এ শারীরিক রোগের মাঝে মনের অসুখ খুঁজে বের করার এক অপূর্ব প্রয়াস। তাই হয়তো অশোক বলে–

"আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম যে, আমি যে দুজন ডাক্তারের পরামর্শ নিয়েছিলাম, তারা কেউ ধরতে না পারলেও কমল বোধহয় ঠিকই ধরেছিল যে কোন

এক ধরনের মানসিক চাপ, যাকে ইংরাজীতে ডিপ্রেসন বলে, আমাকে শারীরিক বিকারে নিগৃহীত করার রাস্তা খুঁজে নিয়েছে। এতদিন ধরে যে সব ব্যাপারে নিজের কাছেও অস্বীকার করতে চেষ্টা করতাম, কমলের সঙ্গে কথা বলার পর কেমন যেন সব উলঙ্গ হয়ে প্রকাশ পেতে লাগলো।'' [৭]

এভাবেই পরতে পরতে মনের খোসা গুলোকে ছাড়িয়ে তার দ্বিধা, আকাঙ্ক্ষা, বিশ্বাসকে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন লেখক। এই অনুসন্ধিৎসার আরেকটি চমৎকার উদাহরণ পাই যখন দেখি অশোক কমল সাধুর দ্বারা ভেলায় ভেসে আসা মহিলার মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চারের গোটা আয়োজনের 'ভেল্‌কি' দেখতে উপস্থিত হয় নদীর পারে, তখন এক সময় সেও গানের ধুয়ার *"জলে ভসিল রে ও মোর নয়নের তারা''* [৮] র সাথে একাত্ম হয়ে যায়। তারও মনে হয় *"জিয়াও সাধু, তুমি ওকে জিয়াও।''* [৯] কিন্তু পরক্ষণেই সর্প দংশনের ভয়ে সে পিছিয়ে আসে। অর্থাৎ আত্মার, বিশ্বাসের মিলন হচ্ছে, কিন্তু সামাজিক বৈষম্য, শিক্ষার যৌক্তিকতা তাকে পিছিয়ে দিচ্ছে। আবার পরিশেষে দেখি এই অশোকই তার পদোদক খাওয়াচ্ছে এক ডিউডেনাল আলসারভুগী কিশোরকে যে কিনা কমল সাধুর আজ্ঞায় তার পুর্বজন্মের পিতা গল্পের 'আমি'র কাছে এসেছে পুর্বজন্মকৃত পাপের ক্ষমা চাইতে। এখানে অশোক পারে না– কিশোরটির অনুরোধের কাছে, পারে না তার পিসির চোখের জলের কাছে। সর্বোপরি পারে না নিজের কাছে। এখানে তার মানবিকতা, তার স্নেহ তার যুক্তিকে হার মানিয়ে দেয়। এভাবেই একটি আপাত আধিবাস্তবিক গল্পের আড়ালে মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম সুতোগুলোক উন্মুক্ত করেছেন লেখক অভিজিৎ সেন। আর এখানেই প্রান্তিকায়িতের পরিসর বিস্তৃত হয়েছে; আজ তাদের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণও বাংলা গল্পের পরিসরে সম্ভব হল।

অভিজিৎ সেন সেই বিকল্প ধারার লেখকদের একজন যারা প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে দাড়িয়ে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের আখ্যানকে তুলে আনেন রচনার কেন্দ্রে। লেখকের একটি অন্যতম গল্প 'মাছ' লেখকের এই প্রয়াসের সার্থক প্রমাণ। এই গল্পটির

প্রধান চরিত্র হল সাগী। এই মহিলা তার নেশাগ্রস্ত স্বামী ও দুইটি শিশুর সংসার একাই চালায়। পেশা দিনমজুরি। তার কাজ ছিল ডাক্তারদের পুকুরে কাঁদায় পা ডুবিয়ে হাত দিয়ে মাছ ধরা,– কেননা এই মাছ জালে ওঠে না। চারিদিকে মালিকদের কড়া নজর। কেননা তাদের কাছে সাগীরা 'শকুনের পাল'। তাই পদ্মবর্ণ চাকরকে সাবধান করে–

"দেখেছিস তো, শকুনের পাল? কড়া নজর রাখবি। না হলে নিমেষে সব লোপাট করে দেবে।" [১০]

কিন্তু এর মধ্যেও আছে মাছ ধরার সাফল্য, ধরতে পারলে উত্তেজনা। এমনই এক উত্তেজনার মুহূর্তে খবর আসে সাগীর ছেলে দুটো ঘোষেদের ক্ষেতের চুরি করে আনা মটরকলাই খেয়ে বিষক্রিয়া হয়ে মৃতপ্রায় অবস্থায়। সাগী ছুটে ছেলেদের নিয়ে সরকারি হাসপাতালে। এখানে অভিজিৎ সরকারি হাসপাতালের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা এতটাই বাস্তবানুগ যে সাগীর কিছু না করতে পারার ব্যথায় ব্যথিত হয় গোটা পাঠককুল। মারা যায় তার দুটি সন্তানই। আর এই সন্তানের একজনকে নিয়ে সাগীর স্বামী ভিক্ষা করে রোজগার করে নেয় তার মাদক কেনার অর্থ। কীটনাশক মেশানো কলাই খেয়ে মারা যাওয়া সন্তানকে নিয়ে ভিক্ষা করতে বসা সাগীর স্বামী 'জোকা'র বয়ান লেখক দিচ্ছেন এভাবে–

"পরদিন সকালে সদর হাসপাতালের সামনের রাস্তায় মৃত সন্তানকে গামছায় শুইয়ে জোকা ভিক্ষা করে। পথচলতি শহুরে মানুষের সহানুভূতি পাওয়ার জন্য সে সব রকম কথা বলে, ভঙ্গি করে।

সে বলে, মরা ছাওয়ালের সৎকারের জন্য কিছু দেন, বাবা–

সে বলে, জোতদার বিষ খাইয়ে মেরেছে আমার ছেলেকে, বাবা–

সে বলে, হাসপাতালের ডাক্তার এক ফোঁটা ওষুধ দেয় নি, দাদারা–

সে বলে, ছেলের মা এখনো অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে, মায়েরা–

এইরকম অনর্গল। কখনো বা মুখ মাথা দুই হাঁটুর মধ্যে গুঁজে মিথ্যা ক্লিষ্ট বেদনা

অবদমন, অশ্রুমোচন।'' [১১]

লেখকের এই বিস্ময়কর ন্যারেশন পাঠককে কেবল ছুঁয়ে যায় না, বরং গভীর আঘাত করে তার চেতনার মর্মমূলে। এই ভাবেই গল্পটি শেষ হয়েও শেষ হয় না, পাঠককে ভাবায়। তিনি দেখান গল্প কেবল শুনলেই শেষ হয় না, গল্প গড়ে তুলতে পারে অভিঘাতও। তাই বোধহয় পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন–

"অভিজিতের গল্প যতটা লেখকের তার থেকে বেশি পাঠকের।'' [১২]

তাই সাগীর বেদনায় শোকার্ত হয় গোটা পাঠককুল। অন্বেষণ করতে চায় সামাজিক পরিকাঠামোয় প্রান্তিকায়িতের প্রকৃত স্থান। এরকমই আরেকটি গল্প 'ছেলের মুখ দেখছে সোমেশ্বরী'। 'বিয়ে দিলে মানুষের পাগলামি সেরে যায়' এই বিশ্বাসে সোমেশ্বরীর সাথে বিয়ে হয়েছিল বিনয়ের। পাগলামি তো সারে নি বরং আরো অতলে হারিয়ে গেছিল বিনয়। বিনয়ের অর্থহীন অস্তিত্বের সংসার থেকে বেরিয়ে সোমেশ্বরী গড়ে তুলেছিল গঙ্গাপদর সাথে সম্পর্ক। এই নতুন সম্পর্কে সে কিছুতেই তার ছেলে গৌরাঙ্গকে জড়াতে পারে নি। কেননা *" 'খানকির ছেলে' শুনতে গৌরাঙ্গ আর রাজি ছিল না।''* [১৩]

কিন্তু গল্পের আকর্ষণ এখানে নয়। সাইকেল চুরি করে পালাতে গিয়ে ছুরির আঘাতে মৃত গৌরাঙ্গের মৃতদেহ মর্গ থেকে ছুটিয়ে নিতে আসা মা সোমেশ্বরীর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে লেখকের নিপুণ কৌশলই এই গল্পের প্রধান আকর্ষণ। যে ছেলে জীবৎকালে কখনোই সোমেশ্বরীকে মা হিসেবে গ্রহণ করে নি, তার মৃতদেহ মর্গ থেকে সৎকারের জন্য পাঠানোর দীর্ঘমেয়াদী প্রচেষ্টার অসাধারণ ন্যারেশনে লেখক অভিজিৎ কেবল মায়ের মর্মাহত অন্তরকেই উন্মোচিত করেন নি, পাশাপাশি উলঙ্গও করেছেন আমাদের হাসপাতাল, মর্গ, প্রশাসন প্রমুখের যথার্থ স্বরূপটিকেও।

"ভাল চেহারার একখানা মেয়েলোক যদি তোমার সঙ্গে থাকে, তবে কাজ খুব তাড়াতাড়ি হয়।'' [১৪]

এই ব্যাখ্যা লেখকের ব্যক্তিগত নয়, এ এক কদর্য সত্য। এই 'ভাল চেহারা' কাজে

লাগিয়ে ছেলের মৃতদেহ হাসিল করতে প্রচেষ্টা নিতে হয় মা সোমেশ্বরীকে। এমনই আমাদের সমাজ। এই সমাজে পোস্টমর্টেম করতে যাওয়া ডাক্তার নেশায় চুর হয়ে মৃতের মা কে বলে,

"যার যায় তার যায়, আমার কোন কলা? এই জগদীশ টাকার কথা বলেছিস?'' [১৫]

এর আগেও বিভিন্ন লেখকের নানান গল্পে হাসপাতালের বিচিত্র বর্ণনা আমরা পেয়েছি, কিন্তু এক মৃত ছেলের মায়ের চোখে হাসপাতালের এই কদর্য রূপের এমন অদ্ভুত ন্যারেশনে অভিজিৎ সত্যিই অনন্য।

যেহেতু প্রান্তিকায়িত সমাজের বিচিত্র স্বরূপ উদ্‌ঘাটনই গল্পকার অভিজিতের অধিকাংশ গল্পের আধেয়, তাই এতে প্রায়শই দেখা যায় লোকায়ত কৌম সমাজের সংস্কারের প্রতিচ্ছবি। এই লোকায়ত কৌম সমাজের মধ্যে সংস্কারের অন্ধকার কতখানি গভীর এর প্রমাণ আমরা পাই 'জেহাঙ্গী', 'পাথরে জলের বিন্দু' 'ডাইন' ইত্যাদি গল্পে। আমাদের দেশের লোকায়ত সমাজে সংস্কার, অলৌকিকতা, ডাইন, ঝাড়ফুঁক, ফোকসিনি, যাদু ইত্যাদি বিষয়গুলির গভীর উপস্থিতি মার্কেজের পথানুসারী লেখকের গল্পে নানাভাবে উঠে এসেছে। গ্যাব্রিয়াল গার্সিয়া মার্কেজ, এই লেখকের সাথে অভিজিতের এই তাত্ত্বিক সামীপ্যের পেছনে কারণ সম্ভবত উভয়ের সামাজিক অবস্থান। ঔপনিবেশিক কালের যন্ত্রণা উভয়ের দ্বারাই অনুভূত, তাই সমস্ত ঔপনিবেশিক হেজিমনি মুছে ফেলতে সচেষ্ট উভয়েই। আইডেনটিটির সন্ধানে তাই উভয়েরই আশ্রয় জাদু বাস্তবতা অর্থাৎ বাস্তবকে সরল নিষ্পাপ চোখে দেখার প্রচেষ্টা। প্রসূন ঘোষের মতে,

"ম্যাজিক রিয়ালিজম মানে আমাদের বাস্তবতার ভেতরে তার অলৌকিকতা আর আশ্চর্যময়তা।'' [১৬]

এই অলৌকিকতা বা আশ্চর্যময়তা কোনো আরোপিত বিষয় নয়। এ প্রকৃতই আমাদের সমাজে প্রবহমান। যদিও তথাকথিত আধুনিক গল্পে আরোপিত যুক্তিনির্ভর

আধুনিকতার ধারণায় অনুপস্থিত। এই যুক্তি আমাদের কেবলই দেয় বিরক্তি, ঘৃণা, আশাভঙ্গের গ্লানি, ধ্বংস, ক্ষয়, বিষাদ, বৈরাগ্য ও বিচ্ছিন্নতা। এর মধ্যে ভবিষ্যতের কোনো সম্ভাবনার আলোর সন্ধান পাওয়া যায় না। এই তথাকথিত আধুনিকতার পথে হাঁটতে রাজি নন লেখক অভিজিৎ সেন। তিনি উৎসপুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়ায় অতীতকে সঙ্গী করে ভবিষ্যৎ রচনার স্বপ্ন দেখেন। এখানেই লাতিন আমেরিকার সাহিত্যিকদের সাথে লেখকের অভিন্নতা। যেভাবে,

"লাতিন আমেরিকার গল্প উপন্যাসে ঔপন্যাসিকেরা নিজস্ব ইতিহাসকে খুঁজতে চান লোকায়ত সমাজের মধ্যে, পুরাবৃত্তের মধ্যে, ব্রাত্য অপাংতেয় জনেদের লোকধর্ম থেকে, তাদের সংস্কার বিশ্বাস থেকে।" [১৭]

তেমনি অভিজিৎও তার রচনায় নিয়ে আসেন লোকায়ত সমাজের মানুষের আচার, সংস্কার, সংস্কৃতি ও বিশ্বাসকে। কখনো 'দেবাংশী' গল্পের সারবান লোহারকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা গভীর বিশ্বাসের কাহিনি আবার কখনো 'জেহাঙ্গী' গল্পটিতে দুই আপাত উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী জেলা কালেক্টরেটের ডেপুটি অনিন্দ্য ও সদরের ডি এস পি অনিমেষের চোখে আমরা দেখেছি সাঁওতাল রমণী জেহাঙ্গী মার্ডির কাহিনি। এই কাহিনিতে উপরিউক্ত ব্যক্তিবর্গের একটি বিশেষ কারণে 'ইন্টারেস্ট' আছে। কারণ –

"শুধু পেশাগত কারণে নয়, অন্য একটি কারণেও অনিমেষের আগ্রহ এই স্ত্রীলোকটির উপরে। জেহাঙ্গী ডাইন।" [১৮]

উচ্চবর্গের দুই প্রতিনিধির বয়ানে প্রান্তিকায়িত সমাজে প্রচলিত একটি বিশ্বাস, বলা ভালো অন্ধবিশ্বাসের কাহিনি উঠে আসছে গল্পের পরিসরে। যদিও এখানে প্রশ্ন থেকে যায় এই তথাকথিত অভিজাতের চোখে প্রান্তিকায়িতের কতটা বাস্তবিক রূপ উঠে আসা সম্ভব! তবে গল্পের ভিন্ন ভিন্ন বয়ানে যে সকল টুকরো ছবি আমাদের সামনে উঠে এসেছে তাতে আধেয় সমাজের প্রচলিত রূপটি আন্দাজ করে নেওয়া যায়। যেমন–

"মৃত্যুকালীন জবানবন্দীতে জেহাঙ্গী বলেছে, ডাইন? ফোকসিনি? হাঃ সাঁওতাল

মেয়েছেলের কপালের লিখন।'' [১৯]

অর্থাৎ এই সমাজে এখনও ডাইন, ফোকসিনি, বাণমারা, বোঙ্গাচালান ইত্যাদি অন্ধবিশ্বাস কাজ করছে। আর এই বিশ্বাসের দরুণই ঘটে যাচ্ছে খুন, হত্যার প্রচেষ্টা ইত্যাদি কার্যকলাপ। কিন্তু এসবের পেছনে কি কেবলই কুসংস্কার আর অশিক্ষা? কাহিনির পরত একে একে খুললে কোথাও যেন মনে হয় এই সব বিশ্বাসের মধ্যে একটি হেরে যাওয়া, বলা ভালো একটি জোর করে হারিয়ে দেওয়া জাতি তার অন্তরের সমস্ত ক্লেশ, গ্লানি, অক্ষমতাকে চরম হিংসাত্মক রূপ দিয়ে হাজির করছে। এই প্রান্তিকায়িতেরা জমিদারের সাথে লড়াইয়ে পেরে উঠছে না, তাই ভাই ভাই নিজেদের মধ্যে লড়াই করে মরছে। ভাই মরলে তার ছেলে কাকিকে ডাইন সন্দেহে মেরে ফেলতে পিছপা হচ্ছে না। আর এতে ইন্ধন যোগান দিচ্ছে কবিরাজ, গুণমানের মত অন্ধবিশ্বাস বেঁচে খাওয়া লোকেরা। প্রমাণ–

"কবিরাজ বলেছে, সে তো শুধু রোগের ওষুধ দিতে পারে, কিন্তু কেউ যদি ক্ষতি করার জন্য বোঙ্গাচালান করে, তবে সে কি করবে?'' [২০]

আর এই বিশ্বাসে আক্রান্ত হচ্ছে গোটা প্রান্তিক সমাজ। তাই জোর গলায়, যুক্তি দিয়ে কেউ এর বিরোধিতা করতে পারছে না। ভাই সুফলের দাওয়ায় ভাশুরপো রেংটার টাঙ্গির কোপে আহত জেহাঙ্গী মার্ডি যখন আছড়ে পড়ে আর রেংটা আবার তাকে আঘাত করতে উদ্যত হয়, তখন সুফল তাকে লাঠি দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিতে পারে; কিন্তু অনিমেষের 'জেহাঙ্গী কি ডাইন?' প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে কুঁকড়ে যায়। প্রতিবাদ করতে পারে না, বরং,

"সে সাহস সঞ্চয় করে বলেছে, জেহাঙ্গী বড় জেদী মেয়ে, স্যার, তবে ডাইন বোধহয় সে নয়।'' [২১]

এই ভয়, এই কুণ্ঠা, সমাজের অভিজাত বর্গের দ্বারা দেওয়া প্রান্তিকায়িতকে উপহার। এখানে যে জেদ করে তাকে খুন হতে হয়।

এভাবেই অভিজিৎ ব্রাত্যজনের 'কালো মহাদেশ' থেকে প্রান্তিকায়িতের নানান রূপ তুলে এনেছেন তার রচনার কেন্দ্রে। এই প্রক্রিয়ায় মাঝে মাঝে দেখা গেছে যে সমস্যাকে একটি অন্যমাত্রা দেওয়ার জন্য লেখক ব্যবহার করছেন যৌনতাকে। যৌনতা, নারীদেহের বর্ণনা, যৌনদৃশ্যের বর্ণনা, এসবে লেখক ইঙ্গিতে বিশ্বাসী নন, বিবরণে বিশ্বাসী। অথচ বিবরণের মধ্যে এমন এক ভাষিক সংযম থাকে যে দীর্ঘ বর্ণণা সত্বেও তা কখনই স্থূল পর্নগ্রাফির রূপ নেয় না। এও লেখকের একটা রচনার কৌশল যার কারণে কেবল যৌনতা নয়, সমস্যাটাই যেন আরও অধিক স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যেমনটি দেখি লেখকের 'মানব দেহের গৌরব', ফাল্গুনী রাতের পালা', 'পিতৃহত্যাবিষয়ক' প্রমুখ গল্প এবং সর্বোপরি অসাধারণ গল্প 'স্ফিংস' এর মধ্যে। অধ্যাপক তপোধীর ভট্টাচার্য লক্ষ করেছেন –

"যৌনতা এ ধরণের গল্পে মুখ্য আধেয় হলেও এর ভূমিকা আসলে রঞ্জন রশ্মির মতো। যুগপৎ ব্যক্তি ও সমাজের বিনির্মাণ করার প্রয়োজনে গল্পকার যৌনতাকে কৃৎকৌশল হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছেন।'' [২২]

এই গবেষকের সঙ্গে সাথে এক ঘরোয়া আলোচনায় লেখক বলেছিলেন যে 'স্ফিংস' গল্পটি তাঁর একটি অত্যন্ত প্রিয় গল্প। অভিজিতের এই গল্পটির মধ্যে এমন একটি অদ্ভুত আকর্ষণ আছে যা আমাদের অন্তরকে শিহরিত করে। মূলত এই গল্পটি এমন একটি রচনা যেখানে যাদু ও বাস্তব একাকার করে মানবমনের এমন এক গ্রন্থিকে পাঠক সম্মুখে উন্মোচিত করে যা আমাদেরকে গল্পপাঠক হিসেবে এক অন্যস্তরে পৌঁছে দেয়। গল্পটিতে ডুয়ার্স থেকে দূরবর্তী আলতাবাড়িতে পোস্টিং হওয়া ফার্মাস সার্ভিস সোসাইটির একজিকিউটিভ অফিসার সুরঞ্জন তার জীবনের একটি বিশেষ সময়ের আখ্যান বন্ধু নির্মলের কাছে ব্যক্ত করতে গিয়ে যে কাহিনির অবতারণা করেছে তাতে গ্রীক পুরাণের দানবী চরিত্র স্ফিংস এর মিথ, কথকের যৌনতার ফ্যান্টাসি এবং বাস্তবিক অবস্থার ক্লেদময়তা মিলে মিশে এক চূড়ান্ত রূপ লাভ করেছে।

গল্পটির ঘটনাস্থল যে আলতাবাড়ি তার পরিচয় দিতে গিয়ে সুরঞ্জন বলেন, *"আর যেখানে গিয়ে পড়লাম সে প্রায় মধ্যযুগের একটা গ্রাম।"* [২৩]

আধুনিক মননে 'বিকশিত' সুরঞ্জনের মধ্যযুগ সম্পর্কে যে ধারণা তা হল দরিদ্রতা, কুসংস্কার, 'অসাধারণ বঞ্চনা', 'অসাধারণ শোষণ'। এর মাঝেই সে আবিস্কার করে তার অফিসে চতুর্থ স্তরের পদে চাকুরিরত নকুলের স্ত্রী আমাতীকে। আমাতীর যে বর্ণনা সুরঞ্জনের বয়ানে উঠে এসেছে তা থেকে জানা যায় আমাতী সুন্দরী নয়, কিন্তু তার লম্বা দেহে, চওড়া শরীরে একটা আকর্ষণ আছে। আকর্ষণ আছে তার চোখের উদাসীনতায় যা সুরঞ্জনকে ভেদ করে। আমাতীর এই বর্ণনায়ই প্রথম আসে স্ফিংস এর প্রসঙ্গ। সুরঞ্জনের ভাষায়,

"আমাতী কোনও অর্থেই সুন্দরী ছিল না। সে একটু লম্বা মেয়ে মানুষ, তা আগেই লক্ষ করেছিলাম। এখন বসা অবস্থায় দেখে বুঝলাম সে যথেষ্ট প্রশস্তও, লম্বা বলে দাঁড়ানো অবস্থায় তেমন বোঝা যায় না। পিঠের মাঝামাঝি পর্যন্ত হ্রস্ব চুল আমাতীর ছড়ানো। মুখখানা চওড়া এবং দৃঢ়। চোখ ঈষৎ মঙ্গোলীয় নাকে অন্য কোন আদল যুক্ত হয়েছিল। আর ছোট নাকটি সামান্য ওল্টানো। ঠোঁট পুরু। চওড়া অনুচ্চ বুক প্রায় প্রশস্ত। সব কিছু মিলিয়ে একটা পাথুরে নিস্পৃহতা। এইভাবে তাকে বসে থাকতে দেখে আমার হঠাৎ স্ফিংস এর কথা মনে হল, যেন স্ফিংস পশ্চিম দিকে তাকিয়ে বসে আছে।" [২৪]

এই স্ফিংস গ্রীক পুরাণের এক দানবী চরিত্র। যার দেহে পাখা আছে, তার দেহের উপরের অংশ নারীদেহ, কিন্তু নিম্নাঙ্গ সিংহের। এই দানবী চরিত্রটির অবতারণা ইডিপাসের গল্পে একটি ধাঁধাকে কেন্দ্র করে। স্ফিংস কোন মানুষ দেখলেই প্রশ্ন করে– 'সকালে চারপায়ে, দুপুরে দুপায়ে, বিকালে তিনপায়ে হাঁটে কোন প্রাণী?' যে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারে না, তাদের সকলকে স্ফিংস হত্যা করে। ইডিপাস প্রথম এই ধাঁধার সঠিক উত্তর দেন, যার পরিণতিতে স্ফিংস ক্রোধে পর্বত থেকে ঝাঁপ দিয়ে

আত্মহনন করে।

এই ভয়ংকর দানবী চরিত্র স্ফিংসই গল্পে এসেছে যৌনতার ফ্যান্টাসির আধার হয়ে। ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন তত্ত্বের আলোয় ব্যাখ্যায়িত হলে ব্যাপারটা অবচেতনের একটি মানসিক আকাঙ্খা থেকে জাগ্রত বলে মনে হয়, কিন্তু কোথাও প্রশ্ন রয়ে যায়, আমাতী সমবায় দপ্তরের অর্থলোলুপ কর্মচারি নকুলের আপাত অসুন্দর অথচ প্রবল যৌনাকাঙ্খা জাগানো স্ত্রী বলেই কি তার তুলনা দানবী চরিত্র স্ফিংসের সাথে? এই কারণেই কী তথাকথিত অভিজাত বর্গের প্রতিভূ সুরঞ্জনের 'উচ্চস্তরের শৈল্পিক চিন্তাচেতনা'র প্রমাণ শান্তিনিকেতনের ব্যাগটি সুরঞ্জনের স্বপ্নে হয়ে যায় আমাতীর নোংরা ব্রেসিয়ার? এখানে মনে হয় সম্ভবত নিজেকে শিক্ষিত, শিল্পসম্মত মনোভঙ্গির অধিকারী মনে করা মধ্যবিত্তের অবচেতনের যৌন ফ্যান্টাসি তার অন্তরে যে প্রবল দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে তা একইসাথে এক প্রবল আকর্ষণ ও ভয়ের জন্ম দেয়, তাই আমাতী সুরঞ্জনের কাছে হয়ে ওঠে দানবী চরিত্র স্ফিংস।

কিন্তু আবার অন্যদিকে আমাতীর কাছে সুরঞ্জন কোনো কল্পনা বা ফ্যান্টাসি নয়, সে আমাতীর কাছে সন্তান লাভের একটা মাধ্যম, যাকে সে বহুদিন ধরে করা পেটকাটি বুড়ির থানে প্রার্থনা ও দোমাসী জোগেনের মন্ত্রপড়ার ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে লাভ করতে চেয়েছে। যেহেতু তার স্বামী নকুল শারীরিকভাবে অক্ষম তাই আমাতীর এই বিশ্বাস ও টোটকায় স্বামী নকুলেরও মত রয়েছে। এক সন্তানহীন নারীর সন্তান লাভের এই কামনা সুরঞ্জনকে চেতনার এক এমন স্তরে পৌঁছে দেয়, যেখান থেকে সে স্কিংকসের মতোই একেবারে খাদের অতলে নিক্ষেপিত হয়। আর এভাবেই লেখকও বাস্তব ও কুহকের সমন্বয়ে পাঠককূলকে তলিয়ে দেন ভাবনার এক গভীর অতলে।

যৌনতাকে আধেয় হিসেবে ব্যবহার করে রচিত লেখকের আরেকটি উল্লেখনীয় গল্প হল 'মানব দেহের গৌরব'। এই গল্পটিতে লেখক এমন একটি নারীচরিত্রের নির্মাণ করেছেন যার শরীরের সংস্পর্শে ঘরের চালা দপ করে জ্বলে উঠতে পারে। এই শরীরই

মিলনকে গোটা জীবন ধরে তাড়িত করে নিয়ে গেছে। স্বামী সন্তান নিয়ে শান্তিতে তার সংসার করা সম্ভব হয় নি, কারণ–

"কোনও কোনও মানুষ পূর্বজন্মের অভিশাপ নিয়ে জন্মায়। কোনও কোনও মানুষের সংস্পর্শে দুর্ঘটনা, হত্যা, অগ্নিসংযোগ, আত্মহত্যা ইত্যাদি ভয়ংকর সব ঘটনার ইন্ধন থাকে। মিলন নিজে একসময় এসব কথায় বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল। যারা ঘটনা বিশ্লেষণ করার মতো মেধাবী এবং স্মৃতিধর, তারা জানে যে জ্ঞানে হোক, অজ্ঞানে হোক, ব্যক্তি বিশেষের অস্তিত্বে অতিপ্রাকৃত ধ্বংসের কারণ লুকিয়ে থাকে। তাদের সংস্পর্শে অকারণ অগ্নিসংযোগ হয়, কিংবা আপাত নিরীহ লোকটি যেখানে যায়, হত্যা সংঘটিত হয়। ঝড় গাছপালা, বাড়িঘর ভাঙে। বন্যা ধেয়ে আসে। মিলন সম্পর্কে তার জাতি সমাজে এধরণের বিশ্বাস জন্মেছিল।'' [২৫]

এই বিশ্বাস জন্মানোর পেছনে কয়েকটি ঘটনা রয়েছে।

* 'সিনেমা করা মেয়েদের মত দীর্ঘ সটান চেহারার মিলন' যে কিনা গ্রামের মহিলাদের ঈর্ষার বস্তু তার প্রপিতামহী লুণ্ঠিতা ধর্ষিতা হয়েছিলেন যা গ্রামবাসী সযত্নে মনে রেখেছে।

* 'গদাইর বউ' মিলনকে স্নানঘরে লুকিয়ে স্নান করতে দেখার সময় তার এক খুড়শ্বশুর দেখেন হঠাৎ করে স্নানঘরের চালায় আগুন ধরে যায়। ঘটনাটির কারণ তিনি অনুমান করেন মিলনের শরীরের উত্তাপ।

* মিলনের স্বামী গদাধর তার বর্ধিষ্ণু দুধের ব্যবসা ছেড়ে লটারির জুয়ায় ফতুর হয়ে এক বেশ্যার বিছানায় পুড়ে মরে..... ইত্যাদি।

মিলনের জীবনের অভিশাপের জন্য বিষয়গুলি ঘটেছে বলে ধারণা কেবল তার জ্ঞাতিজনের নয়, যে মেয়েকে সে প্রাণ দিয়ে আগলে রাখার চেষ্টা করেছে তারও। কিন্তু আসলে যে এসব ঘটনাগুলোর জন্যই মিলনের জীবন অভিশাপে পরিণত হয়েছে এই কথাটি সচেতন পাঠকের বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। তবে গল্পটির কেন্দ্রবিন্দু সম্ভবত

এটি নয়। গল্পের মূল আকর্ষণ লুকিয়ে আছে তার নামে। 'মানব দেহের গৌরব' গল্পে দেখি এই দেহ সময়ে সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা পালন করে মানুষের জীবনে। মিলনের এই দেহের আকর্ষণেই তার খুড়-শ্বশুড় বাধ্য হয় চানঘরের বেড়ায় চোখ রাখতে, আবার এই দেহই তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে, দিয়েছে মাখনের আশ্রয়, আর এই দেহের জন্যই সে ঘৃণার পাত্র তার মেয়ে সুলেখার কাছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'পুতুল নাচের ইতিকথা'য় শশী কুসুম কে বলেছিল *"শরীর, শরীর, তোমার মন নাই কুসুম?"* [২৬] শশী চেয়েছিল কুসুমের মন কে খুঁজতে, কেননা তার শিক্ষিত নাগরিক 'রুচিসম্মত' হৃদয় শরীরকে কেবল শরীর হিসেবে গ্রহণ করতে কোথায় যেন বাধাগ্রস্ত হচ্ছিল, এই বাধা মিলনের ক্ষেত্রে কেউই অনুভব করে নি। কারণ প্রান্তিকায়িতের পরিসরে রোমান্টিক ভালোবাসার পরিসর বড়ই কম। তাই এখানে স্বামী গদাই অক্ষয় সা-র টাকা দিতে পারছে না বলে স্ত্রী মিলন কে সঙ্গে নিয়ে যায় কিছুটা অধিক সময় পাওয়ার আশায়। এভাবেই সমস্ত তৈরি করা ধারণার মর্মমূলে আঘাত করে প্রান্তবাসীর জীবনের বীভৎস বাস্তব সমস্যাকে অদ্ভুত নির্লিপ্ততার সঙ্গে গল্পে তুলে ধরেন অভিজিৎ।

দেশভাগ নিয়ে অভিজিৎ সেন এর কয়েকটি গল্প রয়েছে। দেশভাগ একটি ঘটনামাত্র নয়, দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সর্বোপরি দেশের মানুষের মনের ওপর এর প্রভাব অত্যন্ত গভীর ও সুদূর প্রসারী। দেশভাগের মর্মান্তিক পরিণতি হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই নিজেদের জীবন দিয়ে অনুভব করেছে। এক বিশাল মানবগোষ্ঠী তাদের ধর্মগত, জাতিগত, জন্মগত সমস্ত পরিচয় ভুলে গিয়ে এক নতুন পরিচিতি লাভ করেছিল 'উদ্বাস্তু' রূপে। এরা উৎপাটিত হয়েছে তাদের স্বভূমি থেকে, অনিশ্চিত অস্তিত্ব নিয়ে আশ্রয়ের সন্ধানে কাটিয়েছে বছরের পর বছর। এরা এমন এক জনগোষ্ঠী যাদের শিশুরা নিজেদের চোখের সামনে নিহত হতে দেখেছে তাদের মাতাপিতা, ভাইবন্ধুকে; ধর্ষিতা হতে দেখেছে মা, বোনকে। এই শিশুদের স্মৃতিতে রয়েছে দেশত্যাগ। অভিজ্ঞতায় আছে আশ্রয়ের খোঁজে মাইলের পর মাইল হেঁটে

যাওয়ার দুঃসহ ক্লেশ, আর আছে প্রিয় জন্মভূমি ছেড়ে আসার অশেষ যন্ত্রণা।

এই উদ্বাস্তুদের কোন নির্দিষ্ট আশ্রয় নেই, রাজনৈতিক পরিচিতি নেই, অর্থনৈতিক সবলতা নেই। এরা শেকড় উপড়ে ফেলা জাতি। মাটির সাথে এদের সম্পর্ক ক্ষীণ করে দিয়েছে একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। কিন্তু এত কিছু 'না' এর মধ্যেও যা আছে তা হল বেঁচে থাকার প্রবল আকাঙ্খা ও প্রচেষ্টা। তাই শত প্রতিকূলতার মধ্যে আবার নতুন ভাবে বাঁচার স্বপ্ন দেখেছে এই জাতি। কিন্তু বাঁচবে যে দেশে সেখানে তারা কারা? এরা আহূত? না। এরা সম্পূর্ণ অনহূত। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর একটি প্রবন্ধে লিখেছেন,

"দিল্লিতে সমাসীন আমাদের সরকার ছিন্নমূল পাঞ্জাবীদের সম্বন্ধে যা বললেন না, 'বাঙাল' উদ্বাস্তুদের সম্বন্ধে সেটাই বললেন– এরা ফরেনার।'' [২৭]

এরা এই বিদেশি পরিচয়েই বেঁচে থাকলো, আর পুরুষের পর পুরুষ ধরে চললো তাদের বেঁচে থাকার, থিতু হওয়ার সংগ্রাম।

এখন কথা হল এদের কথা সাহিত্যে স্থান পেল কতটুকু? দেশভাগকেন্দ্রিক ভয়ংকর বিপর্যয়কে নিয়ে কিছু কিছু টুকরো ছবি বাংলা সাহিত্যের পাতায় উঠে আসলেও অন্তরঙ্গভাবে দেশভাগকে অনুভব করে আপন রচনার উপাদান করে তুললেন কয়জন লেখক? দেশভাগের মতো একটা ভয়ংকর ঘটনা ঘটে গেল, কিন্তু এই বিভাজনের প্রতিবাদে বাঙালি বজ্রকণ্ঠে গর্জে উঠল না। যদিও এই শতাব্দীরই প্রথম দশকে বিভাজনের সামান্য উল্লেখ মাত্রে বাঙালি গর্জে উঠেছিল, আন্দোলনের বার্তা শুনিয়েছিল। কিন্তু কার্যত যখন ঘটনাটি সত্যিই ঘটল তখন যেন প্রতিবাদটা ততটা জোরালো হল না। যদিও রঙ্গমঞ্চে বা গানে সেই বিভাজনের, সেই আন্দোলনের কিছু পরোক্ষ ছবি অঙ্কিত হলো, কিন্তু বাংলা কথাসাহিত্যে এর কোনো প্রভাবই যেন তেমনভাবে লক্ষ্য করা গেল না।

"ঘরে-বাইরে ছাড়া বড় মানের ও মাপের এমন কোনো বাংলা উপন্যাসের নাম করা খুব শক্ত যেখানে সেদিনের আর্তি অথবা উদ্দীপনার অন্তত আঁচটুকুও রয়েছে।''

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই মন্তব্য থেকেই এই কথার সত্যতা উপলব্ধি করা যায়।

আসলে বাংলা উপন্যাসের যে ধারা সেই সময় থেকে এখন পর্যন্ত প্রবহমান তা দেশ-কাল-সমাজ-রাজনীতির বাস্তবতা নিয়ে যতটা আলোচনা করে তার অনেক বেশি আলোচনা করে উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্ত কেন্দ্রিক সমাজের নানা টানাপোড়েন নিয়ে। কিন্তু দেশভাগকে যে ব্যক্তি বাস্তবে অনুভব করেছে, এবং যার কাছে তথাকথিত একজন স্বনামধন্য সাহিত্যকার হওয়ার চেয়ে সময় ও সমাজের সার্থক রূপকার হওয়ার আকাঙ্খা অধিক প্রবল এবং সর্বোপরি প্রান্তিকায়িত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, পীড়িত মানুষই যার রচনার প্রধান আধেয় তাঁর লেখায় এই অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গটি উঠে আসবেই, এতে সন্দেহ নাই।

মূলত লেখকের মানসিক পটভূমি নির্মিত হয়েছে এমন এক সামাজিক পরিবেশে যখন মানুষের মূল্যবোধ ক্রমশ পরিবর্তিত হচ্ছিল নানা সঙ্কট যেমন অর্থনৈতিক ক্লিষ্টতা, উদ্বাস্তু সমস্যা, খাদ্য আন্দোলন ইত্যাদির মুখোমুখি হয়ে। অভিজিৎ নিজের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছেন,

"দেশবিভাগের কুঠারাঘাত লক্ষ লক্ষ মানুষের মত, আমাদের পরিবারও হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিল। সমস্ত পাঁচের দশক-আমার স্কুলজীবন দুরন্ত দারিদ্রে পার হয়েছে।...'' [২৯]

এই দারিদ্র, এই দেশছাড়ার শূন্যতা লেখকের অন্তরকে আঘাত করেছিল ভীষণভাবে, তাই এই শূন্যতার আকুতিকে তিনি চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর 'হিমঘর' গল্পের বেগম আমেদ চরিত্রটির মধ্যে। ধর্মের ভিত্তিতে যখন দেশভাগ হল তখন হাজার হাজার হিন্দু পরিবার বাংলাদেশ থেকে ভারতে উঠে আসে আর তেমনি অজস্র মুসলমান পরিবার চলে যায় বাংলাদেশে। এই যাওয়া বা আসায় কোনো পক্ষেরই মানসিক সম্মতি ছিল না, এ ছিল এক বাধ্যতামূলক সিদ্ধান্ত। তাই দেশভাগের বহুবছর পরও বহু হিন্দু

পরিবারের কাছে দেশের বাড়ি বলতে তার পূর্বপাকিস্তানের আস্তানা এবং বহু মুসলমান পরিবারের কাছে পশ্চিমবঙ্গের অলিগলির চিত্রই ভেসে ওঠে। তাই বাংলাদেশ থেকে আগত কর্নেল আসরফ আমেদ এর স্ত্রী বেগম আমেদের কাছে ভারতীয় রক্ষণাগারের কর্মচারী নিশীথ অনায়াসে বলতে পারে, *"আমার দেশ ফরিদপুরে।"* [৩০]
আর বেগম আমেদও এর উত্তরে বলেন,

"আপনার দেশ তো বললেন ফরিদপুরে; আমার কোথায় জানেন?

– আমার দেশ কলকাতায়।" [৩১]

তাই এই শেকড়ের টানেই এতবছর পর স্বামীর কাজের সূত্রে কলকাতায় এসে তাঁর স্বামীরই অধস্তন কর্মচারী নিশীথকে সঙ্গী করে বেগম আমেদ বেরিয়ে পড়েন তাঁর ফেলে যাওয়া দেশের সন্ধানে। খোঁজেন পাগলের মত। কিন্তু এতদিনে বদলে গেছে সবকিছু। নিরাশ হন নিশীথের 'ম্যাডাম'। তাঁর পুরনো আস্তানা, তাঁর বাসস্থান, যেখানে কেটেছে তাঁর শৈশব ও কৈশোরের বড়ই সুন্দর দিনগুলি, তা আর তার আগের অবস্থানে নেই, হতাশ হন ম্যাডাম,

"–কিচ্ছু মিলছে না, নিশীথবাবু। এত মানুষ, এত বাড়িঘর। সব বাড়িই বোধ হয় উঁচু হয়েছে। কোথায় গেল ফাঁকা জায়গাগুলো?.....

কিন্তু নিশীথবাবু, আমি তো সেই বাড়িটা কোথাও খুঁজে পেলাম না। আমার আব্বা এখনও বেঁচে আছেন। তিনি তো কলকাতাকেই এখনো তাঁর দেশ মনে করেন। গিয়ে বলতাম। কি ভীষণ দেশদ্রোহী ভাবুন তো!" [৩২]

এই তির্যক বাক্যবন্ধের মধ্যে লুকিয়ে আছে জন্মস্থান হারানোর বেদনা যা এখনও পীড়িত করে লেখককেও, তাই হয়ত এই বেদনাকে এতটা বাস্তবিক রূপ দানে সক্ষম হন তিনি।

অভিজিৎ সেনের রচনার প্রধান অবলম্বন হলো সাধারণ মানুষ। তাই তাঁর বিভিন্ন রচনায় কোনো না কোনোভাবে হাজির হয়েছে কৃষিজীবন। কৃষিজীবনের নানান

প্রেক্ষিতে নিয়ে লিখতে গিয়ে তিনি বলেছেন উদ্বাস্তু কৃষকদের কঠোর জীবনসংগ্রামের কথা। দেশভাগের ফলে পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে উঠে আসা এই উদ্বাস্তু কৃষকদের জীবনসংগ্রাম কেবল একটি বাড়ি, উদ্বাস্তুর নতুন ঠিকানা কিংবা দুবেলার অন্নসংস্থানের সংগ্রাম নয়, বরং এর মধ্যে দিয়ে তারা নিজেদের অস্তিত্বকেই নতুনভাবে দাঁড় করাতে চেয়েছে, যে অস্তিত্ব রাজনৈতিক প্রক্রিয়াতে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। তাদের নির্দিষ্ট কোনো স্থান নেই, পূর্বপাকিস্তানে বা বাংলাদেশে তারা হিন্দু এই অপরাধে আক্রান্ত হয়, আবার ভারতবর্ষে অখণ্ড দেশের মানুষ হওয়া সত্ত্বেও চিহ্নিত হয় উদ্বাস্তু নামে। এই জায়গাতে তাদের যে আত্মপরিচয় অর্জনের সংগ্রাম, এতে একদিকে যেমন উঠে আসে তাদের সাধারণ জীবনের এক নিরন্তর সংগ্রামের ছবি, আবার অন্যদিকে তেমনি একটা সাংঘাতিক অস্তিত্বের সঙ্কটও আভাসিত হয়। অভিজিৎ সেন এই অস্তিত্বের সংকটের গোড়া ধরে নাড়া দেবার চেষ্টা করেছেন তাঁর বিভিন্ন রচনায়।

দেশবিভাগের ফলে একদিকে যেমন আসামে, উত্তরপূর্বাঞ্চলে উদ্বাস্তু আগমনে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল, তেমনি উত্তরবঙ্গেও জনগোষ্ঠীগত সমস্যা দেখা দিয়েছিল। উত্তর বঙ্গের বেশিরভাগ জমির মালিকই ছিল রাজবংশীরা। সেখানে দেশবিভাগের পরে পূর্ববঙ্গ থেকে আসা হিন্দুরা দিনাজপুর, রংপুর, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার ইত্যাদি অঞ্চলে উঠে আসলো। তারপর তারা ধীরে ধীরে দখলদারি অর্জন করলো, বর্গা ব্যবস্থায় কিছু কিছু ভূমির অধিকার সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হল। তাই উত্তরবঙ্গে গড়ে ওঠা কামতাপুরি আন্দোলনের বিভিন্ন কারণের মধ্যে দেশভাগকেও একটা প্রধান কারণ ধরা যেতে পারে।

অভিজিৎ সেনের বেশিরভাগ উপন্যাসই উত্তরবঙ্গ কেন্দ্রিক। তিনি তাঁর এই উপন্যাস গুলিতে দেখাচ্ছেন উত্তরবঙ্গের রাজনীতি, উত্তরবঙ্গের ভূমিমালিকানায় পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুরা অনেক পরিবর্তন সাধন করছে। মাটির প্রশ্নে, ভূমির প্রশ্নে, আধিপত্যের প্রশ্নে গড়ে ওঠা দ্বন্দ্বের মূলে সম্ভবত এই দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যাই।

যে জাতি গোষ্ঠীগত সঙ্কট তৈরি হয়েছিল উত্তর পূর্বাঞ্চলে,– জনসংখ্যার ভারসাম্য, বিভিন্ন ভাষিক গোষ্ঠীর সংখ্যাগত ভারসাম্য, জমিমালিকানার ভারসাম্য যেভাবে বিপর্যস্ত হয়েছিল প্রব্রজিত মানুষের দ্বারা তা দেশভাগেরই আরেক করুণ ফলশ্রুতি।

অভিজিৎ সেনের জন্ম অবিভক্ত ভারতে ১৯৪৫ সালের ২৮শে জানুয়ারী। জন্মস্থান পূর্ববঙ্গের বরিশাল জেলার কেওড়া গ্রাম। তিনি কলকাতায় আসেন বিশ শতকের পাঁচের দশকের একেবারে শুরুতে। অর্থাৎ অভিজিৎ সেনের সাহিত্যজগতের উন্মেষ ও বিস্তার পশ্চিমবঙ্গে হলেও তাঁর শেকড় ছিল অবিভক্ত বঙ্গের মাটিতে। অন্যান্য সাহিত্যকারদের কাছে যেখানে বিভাজনের ঘটনা যতটা ছিল বাহিত খবর ততটা প্রত্যক্ষ উন্মূলনের বেদনা ছিল না, সেখানে অভিজিৎ সেনের মরমের সাথে স্বাভাবিকভাবেই যুক্ত ছিল দেশভাগের মর্মান্তিক ক্ষত, যার প্রমাণ রয়েছে তাঁর 'কাক', 'সীমান্ত', 'সাইদার এখন তখন' প্রমুখ গল্পে।

'কাক' গল্পের প্রারম্ভেই লেখক জানিয়ে দিয়েছেন যে এ গল্প ছেড়ে আসা দেশে চল্লিশ বছর পর পুনরায় পা ফেলার আকাঙ্খার স্মৃতি মেদুর আখ্যান নয়, বরং এ গল্প দাসমশাই এর গল্প, কিন্তু প্রকৃতর্থে এই গল্পটি দেশবিভাগের শিকার দুই ব্যক্তির শিশুসুলভ সরল কলহের পেছনে লুকিয়ে থাকা মর্মবেদনার ছবি। গল্পকার দাসমশাই এর জবানিতেই ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর নিজের দেশের প্রতি টানকে, আবার অন্যদিকে 'তোমাগো হিন্দুস্থান' সম্পর্কে ধারণাকেও। দাসমশাই এর উক্তি,

"ওর কাউয়াগুলা নিপিত্ইয়া কাউয়া। এই উঠানের চাউল খাইয়া উই উঠানে গিয়া মুসলমানের ভাত খায়।" [৩৩]

আর

"হিন্দুরা এককাট্টা হয়ে ধর্মকর্ম করে। এর থেকে অধর্মের আর কি আছে।" [৩৪]

এই পরস্পর বিরোধী দুটি উক্তি জায়গা পেয়েছে একই ব্যক্তির জবানিতে। আসলে দেশবিভাগ উত্তর পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছিল। পূর্ব-পাকিস্তানে থেকে

যাওয়া হিন্দুদের মধ্যে অনেকেই পাকিস্তানের রাজনীতি, মুক্তিযুদ্ধ ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত থেকেও যেন সেই দেশে শক্ত জমির উপর দাঁড়াতে পারলো না। যে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগ হয়েছিল, সেই দ্বিজাতিতত্ত্বের বিষ-বীজাণু ক্রমশই আক্রমণ করতে লাগলো উভয় দেশের শেকড় পর্যন্ত। ভারতবর্ষে আসা পূর্বপাকিস্তানের হিন্দুরা উদ্বাস্তু বা রিফিউজি পরিচয়েই বেঁচে রইল। তারা ভারতীয় নাগরিক আর হতে পারলো না, কারণ ধর্মে তারা হিন্দু। তাই দেখা যাচ্ছে ধর্মের ভিত্তিতে বিভাগ হয়েও দেশে শান্তি বিরাজ করছে না, বরং সাম্প্রদয়িকতার মহাজিগির সর্বত্রই আওয়াজ তুলছে অহরহ। পূর্ব-পাকিস্তানে হিন্দুরা 'মালাউন' নামে চিহ্নিত হচ্ছে। যেহেতু ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ হয়েছে, তাই এই দেশে হিন্দুদের কোনো স্থান নেই। এমন এক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে গড়ে ওঠা বিদ্বেষ এবং এতদিনকার পাশাপাশি বসবাসের মানসিক বন্ধন এমন আত্মবিরোধের জন্ম দিয়েছে দাসমশাইএর মধ্যে। এ বিরোধ কেবল তাঁর একার নয়, এ বিরোধ দেশভাগ প্রত্যক্ষ করা প্রতিটি ব্যক্তির।

এমনই আরেকটি হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়া গল্প হল 'মানুষের পিছন দিক'। এই গল্পে রাধিকার পুত্র আনন্দ স্বপ্ন দেখে দেশোদ্ধারের। এই আদেশ সে পেয়েছে স্বয়ং স্বামীজির কাছ থেকে। *"অযোধ্যা মুক্ত করতে তো তোমাকেই যেতে হবে বাবা।"* [৩৫] এই আদেশ পেয়ে সে নিজেকে ভগবান রামের প্রতিরূপ ভাবতে যখন পিছপা নয়, তখনই তার সামনে উদ্ভাসিত হয়েছে তার জীবনের এমন এক সত্য যা তাকে ভেঙে চুরমার করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। একাত্তরের যুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সেনারা অপহরণ করে নিয়ে যায় রাধিকাকে। হিন্দুস্তানি মিলিটারি অফিসার আয়ুব খানেদের বাংকার থেকে উদ্ধার করা হয় গর্ভবতী রাখিকাকে। এই রাধিকা যখন আনন্দের চোখে মুসলমানদের প্রতি তীব্র ঘৃণা দেখে তখন সে আতংকিত হয়। এই ঘটনা তার মনে যে চিরস্থায়ী জখম রেখেছে তার তীব্র বেদনা যেন আবার জেগে ওঠে। সে এই সত্যটি গোপন করতে চায় নি আনন্দর কাছে। কিন্তু ঘটনাটির উন্মোচন যেন আনন্দের সাথে তাকেও আবার সেই চরম মর্মান্তিক

পরিস্থিতির সামনে এনে দাঁড় করিয়েছে। রাধিকা থেমে থেমে প্রতিটি কথা উচ্চারণ করে,

"এই চ্যাংরার বাপ হইল-পঞ্চাশ-ষাট-সত্তরজনা খান মিলিটারির একজনা, আর সেই একজনা যে কে তা আমিও কবার পারমো না।" [৩৬]

এই সত্যটি বুকে চেপে সে এতদিন নিজের তথাকথিত অশুচিতাকে বারে বারে অনুভব করেছে, পাপ পুণ্যের দ্বন্দ্বে নিজেকে করেছে জর্জরিত। কিন্তু আজ এই গুমোট ভেঙে জল নামার পালা।

"সেই থেকে রাধিকার কাঁদার পালা শুরু। তার কান্না আর কিছুতেই শেষ হয় না।" [৩৭]

এই প্রতীকী বাক্যবিন্যাসের মাধ্যমে 'ব্যক্তির ক্রন্দনকে দৈশিক ক্রন্দনে' রূপান্তরিত করেছেন লেখক অভিজিৎ সেন।

গল্পকার অভিজিৎ সেন একটি বীক্ষাগত ভূমিতে অবস্থান করেন, তাঁর একটি নির্দিষ্ট তাত্ত্বিক দৃষ্টিও আছে,– কিন্তু তা কখনই তাঁর গল্পের আকর্ষণ কে ম্লান হতে দেয় না, বরং এই আকর্ষণ আরও তীব্র হয়ে জড়িয়ে নেয় পাঠককেও, যার মধ্যে দিয়ে পাঠকও লাভ করে তার নির্দিষ্ট তাত্বিক অবস্থান। বিষয়ের বিচিত্রতায়, চরিত্রের বহুধাবিন্যস্ত বুনটে লেখক এমনভাবে চিন্তাকে বিন্যস্ত করেন যে পাঠক আবার নতুন করে তার এতদিনকার নির্মিত বোধকে পরীক্ষা করে নিতে বাধ্য হয়। বিষয়টিকে আরও পরিস্কার ভাবে বুঝতে পারা যায় লেখকের 'নদীর মধ্যে শহর' গল্পটির আলোচনার মধ্য দিয়ে। এই গল্পটিতে কথক 'আমি' জয়দেবের বয়ানে বিনয় নামের এক ব্যক্তির জীবনের যে ট্র্যাজিক পরিণতির আখ্যান আমাদের সামনে উঠে এসেছে তাতে আমাদের সমাজের শ্রেণিদ্বন্দ্ব, প্রান্তিকায়িতের সীমায়িত পরিসর, এবং সর্বোপরি মানুষের জীবনের এমন কিছু স্তর, চিন্তা চেতনার এমন কিছু পর্যায় যা এতকাল বাংলা কথাসাহিত্যের পরিসরে পৃথক আলোচনার দাবি রাখেনি– তাই হয়ে উঠেছে বিস্তৃত ব্যাখ্যার আধেয়।

যার জীবনের বহুবিচিত্র তরঙ্গের আখ্যান 'নদীর মধ্যে শহর' গল্পটি, সেই বিনয়

কথকের বাল্যকালের বন্ধু। বর্ণহিন্দু সম্প্রদায়ের একই শ্রেণিভুক্ত উভয়ে। তারা উভয়েই উচ্চবর্ণের মাহিষ্য সম্প্রদায়ভুক্ত। তবে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভিত্তিতে বিনয় কথক থেকে কিছুটা উচ্চস্তরেই অবস্থান করে এসেছিল এতকাল। বিনয়ের ঠাকুরদা গোলক মজুমদার ত্রিশ-চল্লিশের দশকের জাতীয়তাবাদী আদর্শকে সামনে রেখে অনেক দান ধ্যান করেছেন যার মধ্যে এলাকার হাসপাতালের জমিদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আবার অন্যদিকে বিনয়ের পিতামহের এই অর্থের দৌলতে তার পিতা মন্মথ মজুমদার একাধারে সুরা ও নারীবিলাসে মত্ত পুরুষ হিসেবে এলাকায় পরিচিত। বিনয়ের ঠাকুরদা তাকে লেখাপড়া করানোর জন্য শান্তিনিকেতনে পাঠিয়েছিলেন, তাই সব মিলিয়ে এক বিচিত্র মানসিকতা গড়ে উঠেছিল বিনয়ের মধ্যে। লেখকের ভাষায়,

"ফলে বিনয়ের রক্তে সম্ভবত তার পূর্বতন দুই পুরুষের দুধরণের আবেগই যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। কিন্তু তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল শান্তিনিকেতনের পরিমণ্ডল থেকে আহৃত এক ধরণের আধুনিকতার বোধ এবং যাবতীয় গ্রাম্য ধ্যান ধারণা, সংস্কার ইত্যাদির ঊর্ধ্বে ওঠার এক নাগরিক আকাঙ্খা।'' [৩৮]

এই আকাঙ্খায়ই হয়ত বিনয় মেথর পাড়ার মহারাণী বাঁশফোরের সাথে লিপ্ত হয়েছে সম্পর্কে। তবে এই সম্পর্কের পেছনে কেবল আধুনিক হওয়ার আকাঙ্খাই নয়, দায়ী কিছু সামাজিক সমস্যাও। শান্তিনিকেতন থেকে বি,এ পাশ করে আসা বিনয় শিক্ষিত ও যোগ্য হয়েও চাকরি পায় নি। তাই দারিদ্র্যের কবলে পড়ে মেথরের ছেলে মেয়েদের লেখাপড়ার নামে কুড়ি-পঁচিশ টাকার জন্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভিক্ষা করতে হচ্ছে তাকে। আর তখনই তার সাথে প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ হচ্ছে কথকের, যে একদা ছিল তারই সহপাঠী। কিন্তু আজ দুই ভিন্ন মেরুতে অবস্থান করছে তারা। কথক জয়দেব সরকারী বাস্তুকারের অফিসে প্রচুর টাকা পয়সা রোজগার করে (বা বলা ভালো উপরি পাওনার অর্থ রোজগারের দ্বারা) শহরতলীর মধ্যে পাকাবাড়ি, আসবাব ও বিলাস সামগ্রীর মালিক। আবার অন্যদিকে বিনয় মেথর পাড়ার মহারাণী বাঁশফোরের প্রেমিক হিসাবে

স্বজন-সমাজচ্যুত হয়ে ঝাড়ুদারদের ভাঙাচোরা কোয়ার্টারে বসবাসকারী, যাকে প্রায়ই মেথরপাড়ার লোকেরা প্রহার করে বহিষ্কৃত করে তাদের বাসস্থল থেকে। লেখক দেখাচ্ছেন, কথক জয়দেবের মধ্যে এককালের বন্ধু বিনয়ের প্রতি এক ধরণের 'করুণা' কাজ করছে। তবে পাঠক হিসেবে কখনও মনে হয় এই করুণার পেছনে একধরণের ঈর্ষা আর বিজয়গর্ব লুকিয়ে রয়েছে। একদিন যে বিনয়কে জয়দেব অর্থ, সামাজিক অবস্থানের ভিত্তিতে হারাতে পারে নি, আজ সেই বিনয়ই তার কাছে এসেছে মেথর পাড়ার ছেলে মেয়েদের শিক্ষাদানের জন্য স্কুল খোলার চাঁদা চাইতে। এই সুযোগ জয়দেব হারাতে চায় নি। তাই বিনয়ের উপর বর্ষিত হয়েছে তার করুণা ও পরামর্শের অযাচিত বর্ষণ। সে বলে,

"বিনয়, কি করলি তুই জীবনটাকে দিয়ে.....।

বিনয়, তুই এভাবে জীবন কাটাবি, এ আমরা ভাবতেও পারিনা। তুই ফিরে আয়, বিনয় আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করে তোর একটা ব্যবস্থা করে দেব।'' [৩৯]

জয়দেব ফিরিয়ে আনতে চাইছে বিনয়কে, ব্যবস্থা করে দিতে চাইছে– কারণ সে তার একজন সমশ্রেণিভুক্ত কে শ্রেণিচ্যুত হতে দেখতে পারছে না। এতদিন ধরে তার যে মানসিকতা তৈরি হয়েছে তাতে একটা মেথরের মেয়ে, একেবারে অন্ত্যজ শ্রেণির মহিলাকে, একজন উচ্চবর্ণের লোক রক্ষিতা হিসাবে রাখতে পারে কিন্তু স্ত্রীর মর্যাদা দিতে পারে না *"একটা মেথরের মেয়েছেলের জন্য জীবনটাকে নষ্ট করল বংশ ও সমাজের মুখে চুলকালি লেপে দিল। ওর বাবার মত রাখত না হয় মেয়েলোকটাকে একপাশে।''* [৪০]

তাই যখন সে বিনয়কে বলে,

".....ফিরে আসবি ওই মেথরপট্টি থেকে, ফিরে আসবি ওই মেয়েলোকটাকে ছেড়ে.....

তুই ফিরে আয় বিনয়, আমি কথা দিচ্ছি আমরা তোর কথা ভাববো, ব্যবস্থা

করব।'' [৪১]

এর উত্তরে বিনয় যখন বলে,

"আর আমার স্ত্রী সন্তান? তাদের কথা কে ভাববে?'' [৪২]

তখন এই 'স্ত্রী সন্তান' শব্দবন্ধ কথকের কাছে বিনয়ের স্বভাবোচিত 'বাড়াবাড়ি' বলে মনে হয়।

আবার অন্যদিকে কাহিনিকে যদি বিনয়ের প্রেক্ষিতে দেখার চেষ্টা করি তখন মনে হয় বিনয় যেন তার জীবনের ব্যর্থতাকেই ভোলার জন্য আশ্রয় করেছে মহারানিকে। মানুষ যেমন জীবনের ব্যর্থতা ভোলার জন্য মাদকাসক্ত হয়, বিনয়ও তেমনি মহারানির নেশায় মেতেছে। আর এর সাথে তার শান্তিনিকেতনি চিন্তা-চেতনা তাকে দিয়েছে এই নেশাগ্রস্ততাকে যুক্তিনির্ভর বিশ্লেষণে দাঁড় করানোর ক্ষমতা। তাই সে বলতে পারে–

"জয়দেব, আমি আর তোমাদের লোক নই।.... তোমরা আমাকে অনেক আগেই ত্যাগ করেছ। আমি মেথর। আমি এখন মলভাণ্ডের পাশে বসে খেতে পারি। নির্বিঘ্নে ঘুমাতে পারি কুকুরকে জড়িয়ে ধরে। স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া মারামারি করতে পারি। আমার স্ত্রী আমাকে ছেড়ে অন্য পুরুষের সঙ্গে চলে যেতে পারে। তোমাদের এটা শুধু পুরুষরাই পারে, যেমন আমার বাবা করেছিল। কিন্তু আমি তাকে ধরে এনে মেরে রক্তাক্ত করতে পারি এবং তারপরে মদ খেয়ে দুজনে হাল্লা করতে পারি। এই সমস্ত কিছুর পরে দুজনে উন্মাদের মত যৌনসঙ্গমে লিপ্ত হতে পারি।'' [৪৩]

কিন্তু সত্যই কি সে 'মেথর' হতে পেরেছিল? প্রাক আধুনিক পর্বের সমাজে সৃষ্ট বর্ণ বিভাজনের ধারা উপনিবেশ পর্বের আধুনিকতা কতটা রুদ্ধ করতে পেরেছিল? বাস্তব অর্থে পারে নি, পারে নি উচ্চবর্ণের চেতনায় নিম্নবর্ণকে গ্রহণ করে নিতে। তাই উচ্চবর্ণের বিনয়ের গর্বিত ঘোষণা– 'আমি মেথর' বাস্তবে মিথ্যা হয়ে গেছে। *"মেথর সে হতে পারে নি, আবার মহারানিকেও বের করে আনতে পারে নি, এই পরিমণ্ডলে থেকে এসব সম্ভবই না। সমাজে যার যেখানে অবস্থান তাকে সেখানেই থাকতে হবে।*

এটাই নিয়ম।'' [৪৪]

এই নিয়মেই চলছে আমাদের সমাজ। যেখানে কোনো উচ্চশিক্ষা, কোনো মানবিক বোধ, কোনো বিজ্ঞান পারছে না মানুষে মানুষে দূরত্ব কম করতে। এই ধারণা তার শেকড় বিস্তার করে নিয়েছে গভীর অতলে।

কিন্তু বিনয়ের মৃত্যুর পর তার কথক বন্ধু বা ডাক্তার আত্মীয় যা পারছে না, তা পারছে তার মেথর পাড়ার স্বজনেরা। মৃত্যু এসে চূড়ান্তভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে, শ্রেণিচ্যুতির অপরাধে তথাকথিত উচ্চবর্ণের ভদ্রজনেরা যারা তাকে ফিরিয়ে আনতে উদ্‌গ্রীব হয়েছিল তারা বিনয় কে ত্যাগ করলেও মেথরেরা স্বজনকৃত্য করতে দ্বিধা করেনি। এখানেই চিরন্তনতা পায় বিনয়ের সেই বহুমাত্রিক বয়ান,

"জীবন? জীবন এরকমই, জীবনের কোন নির্দিষ্ট ধরণ নাই।'' [৪৫]

'নদীর মধ্যে শহর' গল্পটিতে লেখক মধ্যবিত্ত মানসিকতার দ্বন্দ্ব যেমন দেখিয়েছের, তেমনি এতে রয়েছে শ্রেণিদ্বন্দ্বের চিত্র ও চরিত্রের অর্ন্তদ্বন্দ্ব এবং সর্বোপরি জীবন সম্বন্ধীয় এক বাস্তব দর্শনের যথার্থ রূপায়ণ। প্রাবন্ধিক সমালোচক তপোধীর ভট্টাচার্যের ভাষায়,

"এই রচনায় আছে সবকিছু ঃ এক মানুষের অনেক হয়ে যাওয়া, প্রচ্ছন্ন ও প্রকাশের টানাপোড়েন, মানবিক মূল্যবোধের জটিল অন্তঃসার, যৌনতার রক্তমাংস।'' [৪৬]

এভাবেই আখ্যান তৈরি করেন অভিজিৎ। গল্পের আকর্ষণ বজায় রেখে পাঠককে এক নতুন বীক্ষাগত ভূমিতে নিয়ে যান। 'দ্রষ্টাচক্ষু' লাভ করে পাঠক, নির্মাণ করে তার এক স্পষ্ট তাত্ত্বিক অবস্থান। বাস্তবতার নানান মাত্রা উন্মোচিত হয় পাঠকের সামনে। এরকমই একটি গল্প হল 'ব্রাহ্মণ্য'।

অভিজিতের অন্যান্য গল্পের মতো এই গল্পটির প্রধান চরিত্র নচিকেতাও ব্যাঙ্ককর্মী। যে নিম্নবর্গীয় অধ্যুষিত অঞ্চলে তার কর্মস্থল সেখানে ব্রাহ্মণের বড় অভাব।

এতকাল এই গ্রামে খাদ্যাভাবের এত প্রাবল্য ছিল যে ব্রাহ্মণের দরকার পড়ে নি, কেননা নিজেরাই যেখানে খেতে পারছে না, সেখানে ব্রাহ্মণকে মাধ্যম করে ঈশ্বরকে কীই বা অর্পণ করবে! কিন্তু ধীরে ধীরে উন্নয়নের ছোঁয়া লেগেছে গ্রামে, সমৃদ্ধি এসেছে কিছু লোকের ঘরে, আর সেই সঙ্গে প্রয়োজন পড়েছে ব্রাহ্মণেরও, কেননা আমাদের বর্ণবিভাজিত হিন্দু সমাজ আমাদেরকে এতকাল ধরে শিখিয়ে এসেছে যে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কারো কাছে ঈশ্বর কোনো নিবেদন গ্রহণ করেন না। তাই রাইনগরের এই অবহেলিত মানুষগুলির কাছে অন্যান্য বহু প্রত্যাশিত অথচ দূরবর্তী বাস্তবের মতোই ব্রাহ্মণও ছিল কাঙ্খিত ও অভিপ্রেত। এমনই এক প্রেক্ষাপটে নচিকেতা ও কেতকীর সাথে পাঠকের পরিচয়। নচিকেতা ব্রাহ্মণ, কিন্তু কেতকী নয়। অসবর্ণ বিবাহ করার জন্য নচিকেতার বাড়িতে জায়গা হয় নি কেতকীর আর সেই সঙ্গে নচিকেতারও। অভিজিৎ এই গল্পটিতে দেখাচ্ছেন ঔপনিবেশিক শিক্ষায় মানুষ আধুনিক হয়ে উঠেছে, কিন্তু সংস্কার (বলা ভাল কুসংস্কার) এর বাঁধন কিছুতেই কাটছে না। এই সংস্কারে যেমন গ্রামবাসী, তেমনি নচিকেতার শহরবাসী বাবা ও মা আচ্ছন্ন; আবার একইভাবে অসবর্ণ বিবাহে পরিবার থেকে দূরে থাকা নচিকেতা ও কেতকীও। তাই যখন গ্রামবাসী মহাদেব তার পানের বরোজে কেতকীকে প্রবেশ করায় যেখানে কেবল 'বাম্ভনের বেটি'দেরই প্রবেশ মান্য, সেখানে ঢুকতে কেতকীর মনের দ্বন্দ্ব তীব্র হয়। কেননা একদিন এই কেতকীর হাতেই জল খেতে চায় নি নচিকেতার মা আর অন্যদিকে গ্রামবাসী ব্রাহ্মণের মেয়ে বলে তার পায়ের ধুলো জিভে নিয়ে ঠেকাচ্ছে। অন্যদিকে নচিকেতা গ্রামবাসীদের বিশ্বাসের মর্যাদা দিতে চায়। সে তাদের এই বিশ্বাস কে আঘাত করতে চায় না। তাই সে বাজার থেকে পৈতে কিনে এনে গলায় পরে। তার অভিমত এরকম,

"এই সব মানুষ এত অসহায় যে জাতপাত, ধর্মাধর্ম বিষয়ক নাগরিক মূল্যবোধ এখানে অকারণ দুঃখবর্ধক হবে।" [৪৭]

কিন্তু অন্যদিকে কেতকীর কাছে বিষয়টি একধরণের প্রবঞ্চনা বলে মনে হয়।

আসলে নচিকেতার এমন ব্যবহারের পেছনে কয়েকটা কারণ আছে। রাইনগরের পঞ্চায়েত, উন্নয়ন, রাজনৈতিক দলের গ্রাম্য নেতার রক্তচক্ষু টাউট দালাল মস্তানের ষণ্ডামি, সরকার আমলার অশোভন আচরণ সবকিছু মেনে নিয়ে নচিকেতা এই পরিবেশেই চাকরি করতে চেয়েছে। এই মানিয়ে নেওয়াই মধ্যবিত্তের স্বভাব। যে মধ্যবিত্ত উচ্চশিক্ষা অর্জন করতে পারে, কিন্তু তার মনের সংস্কার কাটিয়ে উঠতে পারে না। তাই সে কেতকীকে বোঝায় কেতকীর প্রতি নচিকেতার মায়ের ঘৃণা বা নচিকেতাকে প্রণাম করতে না দেওয়া কেতকীর মা র অন্তরের গভীরে ক্রিয়াশীল সংস্কার মাত্র।

অভিজিৎ সেনের গল্প ভুবনের সংক্ষিপ্ত পরিক্রমার সূত্রে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি যে দেশকালের বাস্তবের ফ্রেমে নানা বর্গ, শ্রেণি ও পেশার বঙ্গভাষি মানুষকে নিয়ে অভিজিৎ যে কথাভুবন তৈরি করেছেন তা, একদিকে যেমন মধ্যবিত্ত জীবনের অন্তঃসার শূন্যতাকে অনাবৃত করেছে, তেমনি 'অপর' পরিসরের দহন কথার বহুস্বরকে উদ্ভাসিত করে তুলেছে। বয়ানের অন্তর্বয়নে লেখকের জীবন বীক্ষা সূত্রধারের ভূমিকা পালন করেছে। উপন্যাসের পাশাপাশি কথাকার অভিজিৎ সেন সত্তর পরবর্তী বাংলা গল্পেও নতুন রক্ত সঞ্চারিত করেছেন।

*****

উল্লেখপঞ্জী ঃ–

১। ভট্টাচার্য, তপোধীর ঃ 'অভিজিৎ সেনের গল্পবিশ্ব', ''পড়ুয়ার ছোটগল্প'', অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, শিলচর বইমেলা, ডিসেম্বর, ২০০৫, পৃষ্ঠা-৮১।

২। সেন, অভিজিৎ ঃ ''বাংলা সাহিত্যের গড় পড়তা লেখকদের পড়বার সময় কোথায়?'', বিকাশ শীল সম্পাদিত 'জনপদপ্রয়াস', বইমেলা জানুয়ারি, ২০০৬ সংখ্যায় প্রকাশিত সাক্ষাৎকার, পৃষ্ঠা- ১৪।

৩। ভট্টাচার্য, তপোধীর ঃ 'অভিজিৎ সেনের গল্পবিশ্ব', ''পড়ুয়ার ছোটগল্প'', অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, শিলচর বইমেলা, ডিসেম্বর, ২০০৫, পৃষ্ঠা- ৮১।

৪। বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থপ্রতিম ঃ 'অভিজিৎ সেনের গল্পের একজন পাঠক ও কয়েকটি গল্পের দর্পন', ''এবং মুশায়েরা'', ৭ম, ২ ও ৩ সংখ্যা, জুলাই সেপ্টেম্বর, ২০০০, অক্টোবর, ডিসেম্বর, ২০০০, পৃষ্ঠা-৭৭।

৫। ভট্টাচার্য, তপোধীর ঃ 'অভিজিৎ সেনের গল্পবিশ্ব', ''পড়ুয়ার ছোটগল্প'', অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, শিলচর বইমেলা, ডিসেম্বর, ২০০৫, পৃষ্ঠা- ৮০।

৬। সেন, অভিজিৎ ঃ 'লখিন্দর ফিরে আসবে', 'পঞ্চাশটি গল্প', সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ২০০০, পৃষ্ঠা- ৩২।

৭। ঐ, পৃষ্ঠা- ৩৬।

৮। ঐ, পৃষ্ঠা- ৪০।

৯। ঐ, পৃষ্ঠা- ৪১।

১০। সেন, অভিজিৎ ঃ 'মাছ', ''পঞ্চাশটি গল্প'', সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ২০০০, পৃষ্ঠা- ২০৯।

১১। ঐ, পৃষ্ঠা- ২১৫।

১২। বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থপ্রতিম ঃ 'অভিজিৎ সেনের গল্পের একজন পাঠক ও কয়েকটি গল্পের দর্পন', ''এবং মুশায়েরা'', ৭ম, ২ ও ৩ সংখ্যা, জুলাই সেপ্টেম্বর, ২০০০, অক্টোবর, ডিসেম্বর, ২০০০, পৃষ্ঠা-৭৮।

১৩। সেন, অভিজিৎ ঃ 'ছেলের মুখ দেখছে সোমেশ্বরী', ''পঞ্চাশটি গল্প'', সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ২০০০, পৃষ্ঠা- ৪৭৬।

১৪। ঐ, পৃষ্ঠা- ৪৭৭।

১৫। ঐ, পৃষ্ঠা- ৪৭৮।

১৬। ঘোষ, প্রসূন ঃ 'অভিজিৎ সেনের ছোটগল্প ঃ একটি বিশ্লেষণ', জনপদপ্রয়াস, প্রবন্ধ সাহিত্য, http:/ www.sristisadan. com/sristisadan/magazine/ content/INPPO2P Abhijit Sen. htm. Page-1.

১৭। ঐ, পৃষ্ঠা- ৪।

১৮। সেন, অভিজিৎ ঃ 'জেহাঙ্গী', ''পঞ্চাশটি গল্প'', সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ২০০০, পৃষ্ঠা- ৩৫১।

১৯। ঐ, পৃষ্ঠা- ৩৫৬।

২০। ঐ, পৃষ্ঠা- ৩৫৩।

২১। ঐ, পৃষ্ঠা- ৩৬৪।

২২। ভট্টাচার্য, তপোধীর ঃ 'অভিজিৎ সেনের গল্পবিশ্ব', ''পড়ুয়ার ছোটগল্প'', অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, শিলচর বইমেলা, ডিসেম্বর, ২০০৫, পৃষ্ঠা-৮২।

২৩। সেন, অভিজিৎ ঃ 'স্ফিংকস', ''পঞ্চাশটি গল্প'', সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ২০০০, পৃষ্ঠা- ৩৭৩

২৪। ঐ, পৃষ্ঠা- ৩৭৫।

* ঘোষ, প্রসূন ঃ 'অভিজিৎ সেনের ছোটগল্প ঃ একটি বিশ্লেষণ', জনপদপ্রয়াস, প্রবন্ধ সাহিত্য, http:/ www.sristisadan. com/sristisadan/magazine/ content/INPPO2P Abhijit Sen. htm. Page-1 এ এই ধাঁধাটির উল্লেখ আছে।

২৫। সেন, অভিজিৎ ঃ 'মানব দেহের গৌরব', ''পঞ্চাশটি গল্প'', সবুর্ণরেখা, কলকাতা, ২০০০, পৃষ্ঠা- ৫৫৩।

২৬। বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক ঃ 'পুতুলনাচের ইতিকথা', প্রকাশ ভবন, কার্তিক, ১৩৫৪ বাং, পৃষ্ঠা- ৯৮।

২৭। বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ ঃ 'বিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি', হর্ষদত্ত ও স্বপন বসু সম্পাদিত, পৃষ্ঠা- ১৬১।

২৮। ঐ, পৃষ্ঠা- ১৬০।

২৯। ঘোষ, প্রসূন ঃ 'অভিজিৎ সেনের ছোটগল্প ঃ একটি বিশ্লেষণ', জনপদপ্রয়াস, প্রবন্ধ সাহিত্য, http:/ www.sristisadan. com/sristisadan/magazine/ content/INPPO2P Abhijit Sen. htm. Page-7.

৩০। সেন, অভিজিৎ ঃ 'হিমঘর', ''পঞ্চাশটি গল্প'', সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ২০০০, পৃষ্ঠা- ৩৯২।

৩১। ঐ, পৃষ্ঠা- ৩৯২।

৩২। ঐ, পৃষ্ঠা- ৩৯৬।

৩৩। সেন, অভিজিৎ ঃ 'কাক', ''পঞ্চাশটি গল্প'', সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ২০০০, পৃষ্ঠা- ২২৯।

৩৪। ঐ, পৃষ্ঠা- ২৩১।

৩৫। সেন, অভিজিৎ ঃ 'মানুষের পিছন দিক', ''পঞ্চাশটি গল্প'', সুবর্ণরেখা,

কলকাতা, ২০০০, পৃষ্ঠা- ৩৯৯।

৩৬। ঐ, পৃষ্ঠা- ৪০৪।

৩৭। ঐ, পৃষ্ঠা- ৪০৫।

৩৮। সেন, অভিজিৎ ঃ 'নদীর মধ্যে শহর', ''পঞ্চাশটি গল্প'', সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ২০০০, পৃষ্ঠা- ৪।

৩৯। ঐ, পৃষ্ঠা- ৮।

৪০। ঐ, পৃষ্ঠা- ৮।

৪১। ঐ, পৃষ্ঠা- ৮।

৪২। ঐ, পৃষ্ঠা- ৯।

৪৩। ঐ, পৃষ্ঠা- ৯, ১০।

৪৪। ঐ, পৃষ্ঠা- ১১।

৪৫। ঐ, পৃষ্ঠা- ৮।

৪৬। ভট্টাচার্য, তপোধীর ঃ 'অভিজিৎ সেনের গল্পবিশ্ব', ''পড়ুয়ার ছোটগল্প'', অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, শিলচর বইমেলা, ডিসেম্বর, ২০০৫, পৃষ্ঠা-৮৮।

৪৭। সেন, অভিজিৎ ঃ 'ব্রহ্মণ্য', পঞ্চাশটি গল্প, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ২০০০, পৃষ্ঠা- ২৪৬।

*****